পুষতে মানা ভুতের ছানা

দিলরুবা নীলা

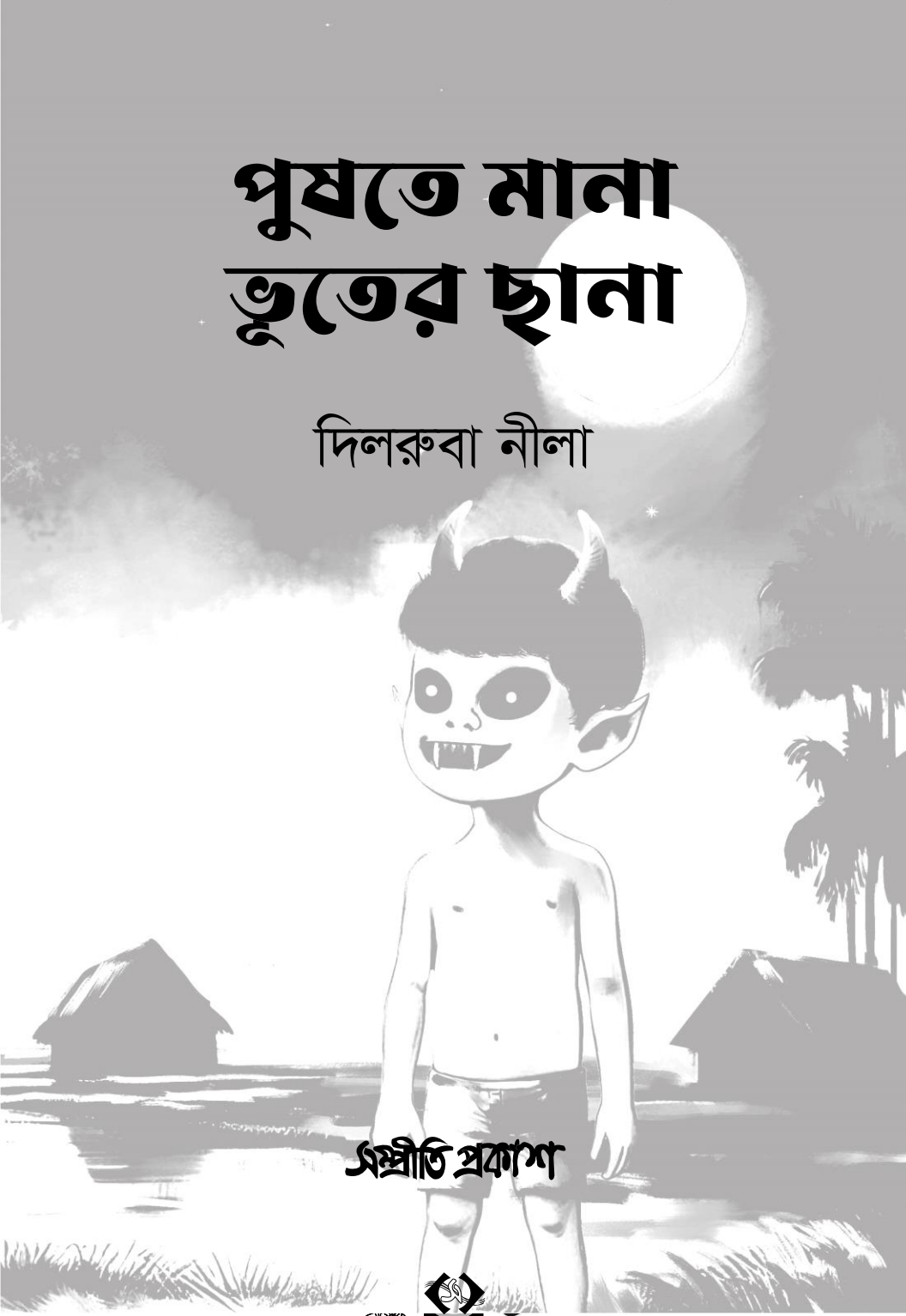

সম্প্রীতি প্রকাশ

উৎসর্গ

শ্রদ্ধেয় স্যার

মো: বজলুর রহমান বিশ্বাস

বড়ো মাপের একজন মানুষ এরকম অল্প কিছু
মানুষ আমাদের চারপাশে প্রায়ই ঘুরে বেড়ান
কিন্তু দূর্ভাগ্যবশত অধিকাংশ সময়েই আমরা
তাঁদের চিনতে পারি না

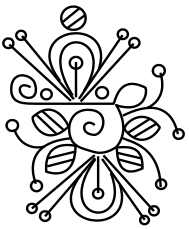

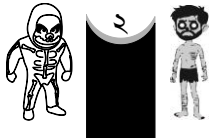

সূচী

কুস্‌মি ● ১১
ছোটোচাচ্চু ● ১৮
ভূতবন্ধুর খপ্পরে ● ২৪
মুমুর স্বপ্ন ● ৩২
টিপুদের নতুন বাসা ● ৩৯
বন্ধু নাকি ভূত ● ৪৬
সেদিন মধ্যরাতে ● ৫৬
ভূত তাড়ালো শিপলুমামা ● ৬৩
পরি ● ৬৯
ভূতের নাম ইমলি ● ৭৫
পুতুলের জন্য ● ৮০
পুষতে মানা, ভূতের ছানা ● ৮৬

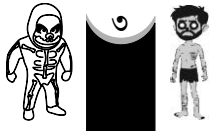

কুস্মি

শারমিন সুলতানা যখন আড়পাড়া স্টেশনে নামলেন তখন সন্ধ্যে সাতটা। পৌঁছানোর কথা ছিল পাঁচটায়। পথে জ্যাম থাকার কারণে বাস দু-ঘণ্টা লেট। বাস থেকে নেমে কিছুদুর হেঁটেই শিমুলতলি গ্রাম। সেখানেই একটা প্রাথমিক বিদ্যালয়ে চাকরি হয়েছে শারমিনের। শারমিনের গ্রামের বাড়ি শিমুলতলিতেই। সে সূত্রেই তার এখানে পোস্টিং। কিন্তু শারমিনের বাবা-চাচারা কেউই এ গ্রামে থাকেন না। গ্রামের বাড়ির ঘর তালা বন্ধ আছে দীর্ঘদিন।

শারমিনের এম.এ পরীক্ষা শেষ হয়েছে কিছুদিন মাত্র হলো। নিতান্ত শখের বসে তিনি চাকরির আবেদন করেছিলেন আর হয়েও গেল। গত সপ্তাহে মাকে নিয়ে এসে বাড়ি ঘর পরিস্কার করে রেখে গেছেন শারমিন। আগামীকাল স্কুলে যোগদান করবেন। তাই আজ আসা। শারমিনের সঙ্গে কেউ আসেনি।

বাস থেকে নেমেই শারমিনের মেজাজ খারাপ হয়ে গেল। সন্ধ্যা সাতটা কী এমন রাত! তাতেই একটা রিকসাও নেই। বড়ো বড়ো ব্যাগ নিয়ে তিনি কীভাবে যাবেন?

তার পিছু। মিনিট বিশের মধ্যে ওরা পৌঁছে যায় শারমিনদের বাড়ি।

শারমিন তালা খুলে ভেতরেঢোকেন।

লাইট ফ্যান ছেড়ে দিয়ে বিছানায় গা এলিয়ে দেন। ছোটোবেলা থেকেই বাস জার্নিতে অভ্যস্ত নয় সে। বাসে উঠলেই খারাপ লাগে। হঠাৎ মনে পড়ে বারান্দায় তার দুটো ব্যাগ সহ কুস্‌মি নামের মেয়েটি রয়েছে।

ঝটপট বারান্দায় আসেন শারমিন। কিন্তু ব্যাগ ছাড়া কিছু দেখতে পান না। কুস্‌মি ব্যাগ নামিয়ে দিয়েই চলে গেছে। আহা বেচারা কুস্‌মি। মেয়েটির হাতে এক প্যাকেট বিস্কুটও দিতে পারলেন না। শারমিনের নিজের প্রতি ভীষণ বিরক্ত লাগে।

মায়ের দেওয়া রান্না করা খাবার খেয়ে ঘুমিয়ে পড়েন শারমিন।

ছোটোচাচ্চু

আজ আলভীর ভীষণ ভাবে মনে পড়ছে ছোটোচাচ্চুর কথা। অবশ্য শুধু আজ না। প্রায় প্রতিদিনই ছোটোচাচ্চুর কথা আলভীর মনে পড়ে। আর মনে পড়লেই কোথা থেকে যেন পানি এসে চোখ ভরে যায়। তখনই মা অথবা ফুপি এসে বলে কীরে আলভী কাঁদছিস? কী হলো তোর? আর কিছু হলেই কাঁদতে হবে? তুই কি মেয়ে নাকি?

এদের কথার ভয়ে আলভী ঠিকমতো কাঁদতেও পারে না। মা, ফুপি যেন কেমন!

কান্নার আবার ছেলে-মেয়ে কী। মন খারাপ তো সবারই হতে পারে।

আজ ছোটোচাচ্চুর কথা মনে হবার বিশেষ কারণ আছে।

আজ রাতের ট্রেনে আলভী চট্টগ্রাম যাচ্ছে। সেখানকার ক্যাডেট স্কুলে ভর্তি হয়েছে। ভর্তি হয়েছে এক বছর হলো। ছুটিতে বাড়িতে এসেছিল আজ রাতে আবার যাচ্ছে। তবে এবারের যাওয়া বিশেষ কারণে গুরুত্বপূর্ণ।

আলভী আজ রাতে যাচ্ছে একা।

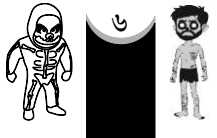

আলভীর বাবা নেই। বাড়িতে সে, মা আর ফুপি।

এতদিন মায়ের সঙ্গেই সে যাওয়া আসা করত। কিন্তু মা বলেছে এখন থেকে তার একাই যেতে হবে। আর একা যাওয়া এমন কি কঠিন? ট্রেনে উঠিয়ে দিয়ে আসব।

ওখানে স্টেশনে আলভীর খালামনি থাকবেন। তিনি আলভীকে নিয়ে তার বাসায় যাবেন। তারপর বিকেলে ক্যাডেট কলেজে দিয়ে আসবেন।

আলভী এবার ক্লাস সেভেনে। যথেষ্ট বড়। মা বলেন যাদের বাবা থাকে না তাদের নাকি আগে আগে বড়ো হতে হয়।

কিন্তু আলভী জানে ছোটোচাচ্চু থাকলে তাকে কখনওই একা যেতে হত না।

অবশ্যই চাচ্চু তার সঙ্গে যেত।

এই তো মাত্র দুই বছর আগের কথা। ছোটোচাচ্চু ছিল আলভীর খেলার সাথী এবং প্রিয় বন্ধু। চাচ্চুর হাতে ভাত না খেলে

ভূতবন্ধুর খপ্পরে

আজ প্রায় এগারো বছর পর গ্রামের বাড়ি যাচ্ছে রানা। ওদের গ্রামের বাড়ি স্বরূপকাঠী। ও গাড়ীতে ওঠে বিকেলে। পদ্মাসেতু হয়ে যাওয়ায় ওখানে যেতে খুব বেশি সময় লাগে না। রানা যখন বাসে ওঠে তখন আকাশ ঝকঝকে পরিস্কার ছিল। মেঘের ছিটেফোঁটাও ছিল না। কিন্তু হঠাৎ করে কোথা থেকে যেন আকাশ অন্ধকার করে বৃষ্টি নামল। শুধু বৃষ্টি নাকি, বৃষ্টির সঙ্গে টপটপ করে শিল পড়তে লাগল। বৃষ্টির দাপটে ড্রাইভার রাস্তার পাশে বাস থামিয়ে রাখতে বাধ্য হলো। বাস পুণরায় ছাড়ল ত্রিশ মিনিট পর। বৃষ্টি একদম থেমে গেছে।

আবহাওয়া শীতল। রানার মনে হয়, এই বৃষ্টিটার খুব দরকার ছিল।

রানার বয়স এখন একুশ। সবে মাত্র ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি হয়েছে। লেখাপড়ার পাশাপাশি একটু আধটু লেখালেখি করে। হুটহাট করে আজব কিছু করে ফেলা তার স্বভাব। বেশ কিছুদিন ধরে তার লেখালেখি হচ্ছে না। নতুন কোনো প্লটই মাথায় আসছে না। আজ সকালেই মনে হল একটু কোথাও ঘুরে আসলে হয়ত

মাথাটা খুলবে। যেই ভাবা সেই কাজ। মায়ের প্রবল নিষেধ অগ্রাহ্য করে আজ সে যাচ্ছে স্বরূপকাঠী।

রানারা স্বরূপকাঠী ছেড়েছে এগারো বছর হল। রানা ক্লাস ফাইভ পর্যন্ত ওখানকার একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পড়েছে। ওর বাবা থাকতেন ঢাকায়। দাদা-দাদি, মা আর রানা থাকত গ্রামের বাড়ি। রানার দাদা-দাদি মারা যাবার পর ওরা ঢাকায় চলে আসে। ওদের গ্রামের সম্পর্কের এক চাচা যার নাম মিলন সেই ওদের বাড়িতে থাকে। রানার বাবা মাঝে মধ্যে বাড়িতে এলেও বিগত এগারো বছরে রানার কখনও আসা হয়নি।

রানা বাস থেকে নেমেই দেখে মিলন চাচা দাঁড়িয়ে আছে। চাচা রানাদের ঢাকার বাসায় প্রায়ই যাওয়া-আসা করেন। তাই রানাকে খুব ভালোবাসেন।

কেমন আছ বাবা? কতদিন পরে এলে!

জি, চাচা ভালো আছি। হ্যাঁ অনেকদিন পর এলাম।

মুমুর স্বপ্ন

মা-মা পানি দাও। মুমুর ডাক শুনে শোয়া থেকে লাফ দিয়ে ওঠে ওর মা, মুনিরা।

কী হয়েছে, মামনি? খারাপ লাগছে?

না মা খারাপ লাগছে না, পিপাসা পেয়েছে।

মুনিরা বিছানা থেকে নেমে মুমুকে পানি এনে দেন।

আর কিছু খাবে, মামনি? একটা বিস্কিট বা কলা?

না, মা কিছু খাব না, ঘুমাব।

মুমু শুয়ে পড়ে। কিন্তু তার চোখে মোটেও ঘুম আসছে না। আজ নিয়ে চার রাত সে একই স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্ন দেখে আর দেখার সময়টুকুতে সে ভীষণ ভয় পায়। যদিও স্বপ্নটা মোটেও ভয় পাবার মতো নয়। তবুও সে ভয় পায়।

মুমু স্বপ্নে দেখে খুব সুন্দর একটা রাস্তা। রাস্তার দু'পাশে ফুলের গাছ। সে সব গাছে লাল, নীল, হলুদ, সাদা সব রঙের ফুল ফুটে আছে। সেই ফুলগুলো সব অপরিচিত। গাঁদা, গোলাপ নয়। সেই রাস্তা দিয়ে মুমু রিকশায় করে যাচ্ছে। এটা ভীষণ সুন্দর একটি স্বপ্ন কিন্তু স্বপ্ন দেখার সময়টুকু মুমু ভীষণ ভয় পায়। ভয় পাবার কারণ দুটো। এক, মুমু রিক্সায় একা থাকে। মা কিম্বা বাবা ছাড়া সে

কখনো কোথাও যায়নি। একা যাওয়ায় তার জন্য ভয়ের বিষয়। কারণ নম্বর দুই, মুমুর স্বপ্নের সেই রিকশায় কোনো চালক থাকে না। রিকশা চলে একা একা। কী ভয়ানক!

মুমু সারাক্ষণ এক্সিডেন্টের ভয়ে থাকে।

পরপর চার রাত মুমু এ স্বপ্ন দেখে আর ভয় পেয়ে ঘুম থেকে জেগে ওঠে।

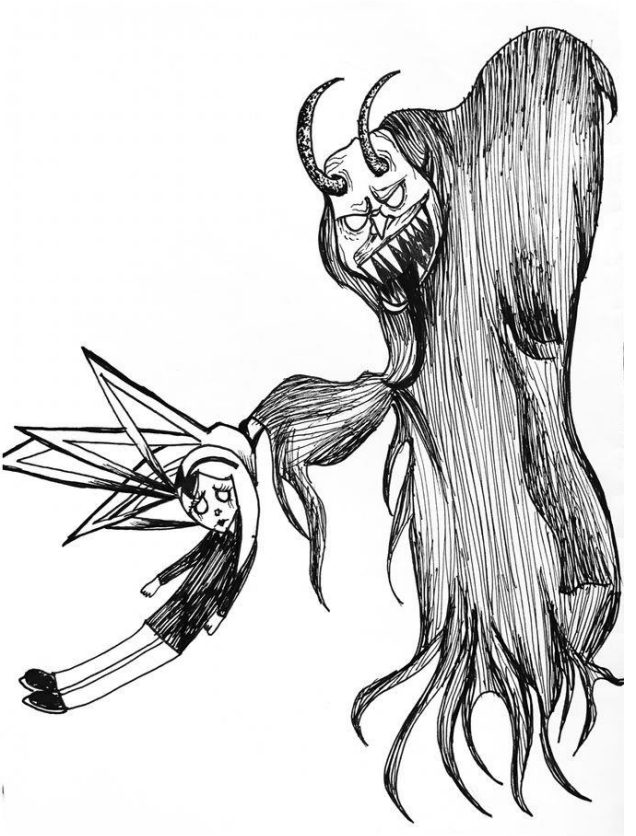

রোজই তার রিকশা একটা প্রকাণ্ড লোহার গেটের সামনে থামে। লোহার গেটের উপরে লেখা 'পুষ্পকানন'। মুমু রিকশা থেকে নামতে গেলেই তার পা আটকে যায়। মনে হয় কে যেন তার পা সুপারগ্লু দিয়ে লাগিয়ে দিয়েছে।

টিপুদের নতুন বাসা

টিপুরা নতুন বাসাতে এসেছে এক সপ্তাহ হলো।

শুধু বাসাট যে নতুন তা নয়। এ শহরটাও টিপুর কাছে নতুন। ওর বাবা সরকারি অফিসার। তাই দু'-এক বছর পরপরই নতুন নতুন জায়গায় বদলী হন তিনি। আর টিপুরও বছর বছর নিত্য নতুন স্কুলে ভর্তি হতে হয়।

এক সপ্তাহ হলো টিপুরা বগুড়ায় এসেছে। টিপু ভর্তি হয়েছে বগুড়া জিলা স্কুলে। স্কুলে যাওয়া আসার সুবিধার জন্য স্কুলের খুব কাছেই ওরা বাসা নিয়েছে।

প্রথমদিন নতুন বাসা দেখতে এসেই টিপুর খুব ভালোলেগে যায়। যদিও বাসাটা পাঁচতলায়। তাতে কী। লিফট তো আছে। টিপুর বাসাটা ভালো লাগার অন্য একটি কারণ আছে। কারণটা হলো বাসার সামনেই বিশাল মাঠ। বিকেল হলেই অনেক ছেলে এখানে ক্রিকেট খেলতে আসে। ক্রিকেট পাগল টিপুর জন্য এটা এক বিশাল পাওনা।

আজ টিপুর এখনকার স্কুলের দ্বিতীয় দিন। সে আজ একাই যাবে। প্রথম দিন ওর মা নিয়ে গিয়েছিলেন। একা যাওয়া কোনো ব্যাপারই না। কারণ স্কুলটা ওদের বাসা থেকে পাঁচ মিনিটের পথ।

ঘর থেকে বের হয়ে লিফটে ঢোকে টিপু। লিফটের দরজা বন্ধ হতেই দেখে ভেতরে ওর বয়সী একটা ছেলে। গায়ে টকটকে হলুদ গেঞ্জী আর জিনসের প্যান্ট। কুচকুচে কালো চুল। চোখ দুটো কী মায়া মায়া! টিপু অনেক গল্পের বই পড়ে। টিপুর মনে হলো ছেলেটির চেহারার সঙ্গে রূপকথার ডালিম কুমারের সঙ্গে বেশ মিল আছে। কিন্তু ছেলেটি লিফটে ঢুকল কখন? নাকি আগে থেকেই ছিল। কী জানি? টিপু কিছুই মনে করতে পারে না।

তুমি এ বাড়িতে নতুন বুঝি? ছেলেটিই প্রথম কথা বলে।
হ্যাঁ নতুন। তুমি কতদিন? টিপু জানতে চায়।
আমি অনেক দিন। এ বাড়ির শুরু থেকেই বলতে পারো।
ও আচ্ছা। তোমার নাম?

বন্ধু নাকি ভূত?

তোর আজকাল কী হয়েছে রে টিংকু? কেন এমন করিস বলতো?

বাড়ির সামনের মাঠটাতে শুয়ে ছিল মুসা। বসন্তের পরন্ত বিকেল। ঝিরঝির বাতাসে আশেপাশের গাছ থেকে শুকনো পাতা এসে পড়ছিল মুসার শরীরে। সেগুলো শরীর থেকে সরানোর বিন্দু মাত্র ইচ্ছা নেই মুসার। বেশ লাগছে তার। তার শরীর ঘেঁষে বসে ছিল টিংকু।

কী হলো কথা বলছিস না কেন? কী হয়েছে তোর?

প্রশ্নটা করে টিংকুর দিকে তাকায় মুসা।

এই মুহূর্তে সে টিংকুর ওপর ভীষণ বিরক্ত।

ওহ তুই কী করে কথা বলবি? তুইতো কথা বলতে জানিস না। আরে বাবা মাথা নেড়ে বোঝাতে তো পারিস? না কি তাও ভুলে গেছিস?

মুসার কথা শুনে এবার টনক নড়ে টিংকুর।

সে এক লাফে মুসার গায়ের ওপর উঠে বসে।

মুসার রাগ পড়ে যায়। মুসার এই এক সমস্যা। ভয়ানক রাগ নিয়ে টিংকুকে বকা ঝকা করে ঠিকই কিন্তু একটু পরই সব ভুলে যায়। আজও তার ব্যতিক্রম হলো না। সে পরম মমতায় টিংকুর মাথাটা তার বুকের সঙ্গে চেপে ধরে।

টিংকু বেছে বেছে তোর সঙ্গে যাদের বেশি ঘনিষ্ঠতা তাদেরকেই আঘাত করে।

এই যেমন আজ তোর বাবার অন্য ছাত্রদের সে কিছুই বলল না। শুভকে আঘাত করল। কারণ শুভ তোর বেস্টফ্রেন্ড।

কিন্তু মা ওতো অন্যদেরও তাড়া করে।

হ্যাঁ করে, তবে সবাইকে না। সেদিন তোর শফিক চাচাকে করল। কারণ তোর শফিক চাচা তোর জন্য খাবার নিয়ে এসেছিল।

ওইদিন যে শিউলিকে তাড়া করল।

বেচারি শিউলি তো কেঁদে কেঁদে শেষ?

হ্যাঁ শিউলিও ওর আঁকা ছবিটা তোকে দেখাবে বলে নিয়ে এসেছিল।

তাইত মা, এভাবে তো ভেবে দেখিনি।

তাহলে টিংকু আমাকে ভালোবাসে না? আমাকে পছন্দ করে না?

শক্ত করে আমার হাতটা ধর। শুভ ডান হাতটা বাড়িয়ে দেয়।

মুসা শক্ত করে শুভর বাড়িয়ে দেওয়া হাতটা ধরে।

শুভ মুসার হাত ধরে নদীর পাড় ধরে হাঁটতে থাকে।

কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে দেখতে পায় টিংকু পড়ে আছে বালুতে।

টিংকু বেঁচে নেই। মুসার ওপর তীব্র অভিমান করে চিরদিনের জন্য পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছে টিংকু।

কীভাবে হলোরে শুভ? কাঁদতে কাঁদতে মুসা জানতে চায়।

জানি না কিছু। একটু আগে গোসল করতে এসে দেখতে পেলাম। দুই বন্ধু মিলে নদীর পাড়েই মাটি খুঁড়ে কবর দেয় টিংকুকে।